তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যাবে ডিএনএ-তে

কম্পিউটারের হার্ডডিস্কে যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায়, ঠিক একইভাবে ডিএনএ'র ভেতরেও তথ্য সংরক্ষণ করা সম্ভব। শুধু তা-ই নয়, ডিএনএ-তে বিভিন্ন কোডও সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব। বিষয়টি নিয়ে এখন সারাবিশ্বে রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেছে। এ নিয়ে বিস্তারিত লিখেছেন আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশী বিজ্ঞানী-

ড. মশিউর রহমান

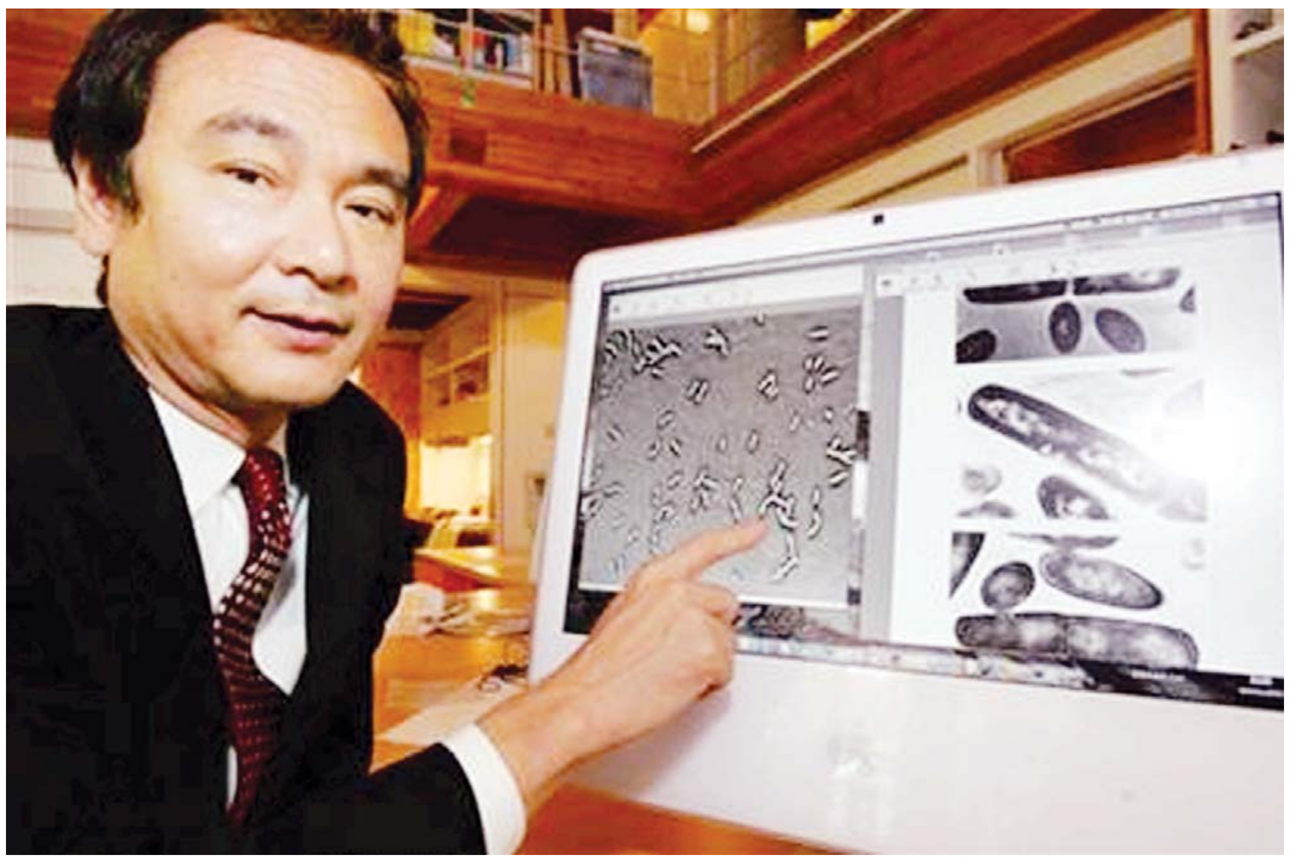

জাপানি বিজ্ঞানী মাশারু তমিপা দেখাচ্ছেন তিনি কীভাবে ব্যাকটেরিয়াতে $e=mc^2$ এবং ১৯০৫ সংরক্ষণ করে রেখেছেন

ডিএনএ কী

ডিএনএ হলো আমাদের শরীরের তথ্য সংগ্রহ করে রাখার একটি ভাণ্ডার। বংশ পরম্পরায় পূর্বপ্রজন্মের শারীরিক গঠন চারিত্রিক গুণাবলীসহ অনেক তথ্য পরবর্তী প্রজন্মের কাছে বাহিত হয় এই ডিএনএ'র মাধ্যমে। আমরা অনেক সময় বলি যে, রক্তের বন্ধন; আসলে রক্তের বন্ধন না বলে বলা উচিত ডিএনএ'র বন্ধন। কারণ বাবা-মা'র পরে যে সন্তান হয়, তার মধ্যে সম্পর্কটা তৈরি হয় ডিএনএ দিয়েই। ডিএনএ'র একটা বড় অংশই বাবা ও মার কাছ থেকে সন্তানের কাছে বাহিত হয়। প্রকৃতিতে ডিএনএ'র ভেতর তথ্যগুলো সংগৃহীত থাকে এবং সেই তথ্যগুলোকে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দিয়ে পড়া সম্ভব। এটা বিজ্ঞানীরা এখন হরহামেশাই করছেন এবং বিশেষ করে আমাদের ল্যাবেও আমরা কাজটি করে থাকি। আমরা সাধারণত একটা ডিএনএকে কপি করি কিংবা সেটাকে আরো পরিবর্ধন করি। বাচ্চারা যেভাবে লেগো দিয়ে ঘর-বাড়ি তৈরি করে আমরা তেমনিভাবে ডিএনএ দিয়ে ইচ্ছেমত ব্লক বানাই। অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে আমরা সরাসরি মানুষের ডিএনএ ব্যবহার করি না, আমরা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া থেকে তৈরি করা কৃত্রিম ডিএনএ ব্যবহার করি। কিছু কিছু ল্যাব আবার সরাসরি মানুষের ডিএনএ'কে ব্যবহার করে।

আজ থেকে অনেক বছর আগে জিনোম প্রজেক্ট নামে একটি প্রজেক্ট আমাদের বিজ্ঞানীদের জগতে খুব জনপ্রিয় ছিল। জিনোম প্রজেক্টের লক্ষ্য ছিল আমাদের মানুষের যে ডিএনএ আছে তার তথ্যগুলোকে সংগ্রহ করা। জিনোম প্রজেক্ট সমাপ্ত হয়েছে এবং এখন আমরা জানি আমাদের ডিএনএ'র গঠন এবং এতে কী আছে।

ডিএনএ'র ভেতর কতখানি তথ্য থাকতে পারে?

ডিএনএ মূলত চারটি উপাদান দিয়ে গঠিত। সেগুলো হলো এডিনিন, থাইমিন, সাইটোসিন এবং গুয়ানিন। ডিএনএ'তে এই A,T,C ও G গুলো বিভিন্নভাবে সাজানো থাকতে পারে এবং এই সাজানোর ক্রমান্বয়ের মাধ্যমে কিংবা বিন্যাসের মাধ্যমেই তথ্যকে সংগ্রহ করে রাখা হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ডিএনএ'তে শুধু তথ্য থাকে, এটি নিজে কোনো কিছু তৈরি করে না। আমাদের কোষ এই ডিএনএ'র তথ্যগুলোকে ব্যবহৃত করে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন তৈরি করে যা দিয়ে আমাদের শরীর গঠিত হয়। আপনার ত্বক সাদা কিংবা কালো হবে কি-না তা নির্ধারণ করে এই ডিএনএ।

এতদিন পর্যন্ত ডিএনএ'তে তথ্য সংগ্রহ থাকতে এবং ডিএনএ থেকে আমরা তথ্য এক্সট্রাক্ট করতাম বা সিক্যুয়েন্সটি বের করতাম। সব থেকে মজার ব্যাপার যে কিছুদিন আগে জাপানি এক গবেষক কেইও বিশ্ববিদ্যালয়ের মাশারু তমিপা একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। যেখানে ডিএনএ'র ভেতরের তথ্যকে সংগ্রহ করে রাখা যাবে। তারা তথ্য সংরক্ষণ বা ঢুকানোর জন্য '$e=mc^2$' এবং '১৯০৫' কে বেছে নিয়েছিলেন। প্রথমটি আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র ও ১৯০৫ সালে তিনি এই সূত্রটি আবিষ্কার করেছিলেন। ড. তমিপার গবেষক দল এই তথ্য দুটি একটি ব্যাকটেরিয়ার ভেতরে লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরে সেই লিপিবদ্ধ তথ্য থেকে তথ্য দুটি আবার পড়তে সক্ষম হয়েছিলেন। আজ পর্যন্ত কেউ কোনো কিছুর ভেতর ডিএনএ দিয়ে এভাবে তথ্যকে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারেনি। এটিই প্রথম একটি আবিষ্কার যা থেকে প্রমাণিত হলো ডিএনএ'র ভেতরেও আমরা বিভিন্ন কোড সংগ্রহ করে রাখতে পারি।

কেন ডিএনএ'র ভেতরে তথ্য রাখা নিয়ে এত হৈচৈ?

হৈচৈ'র মূল কারণ হলো কম্পিউটারের জগতে বিভিন্ন হার্ডডিস্কে যেভাবে তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায়, ঠিক একইভাবে অন্য কোনো মাধ্যমে, বায়োলজিক্যাল জিনিসপত্রের মধ্যেও রাখা যায় কি-না, তা নিয়ে অনেক গবেষণা চলছিল। ডিএনএ'র ভেতরে এত তথ্য রাখার ধারণক্ষমতা আছে দেখে মানুষ সব থেকে আশ্চর্য হয়েছিল এবং তারা মনে করেছিল যে ডিএনএ-ই পারে মানুষের সেই ইচ্ছে পূরণ করতে। তথ্য সংগ্রহ করে রাখার এই পদ্ধতিটি যখন জাপানের বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করলেন; তখন অন্য বিজ্ঞানীরা পরামর্শ দিচ্ছেন যে শুধু ব্যাকটেরিয়াই না, প্রয়োজন হলে তেলাপোকাকেও ব্যবহার করতে। অর্থাৎ তেলাপোকার মধ্যে ডিএনএ সংগ্রহ করে রাখা যায় কি-না সেটা নিয়ে ভাবছেন। কেন তেলাপোকা? এতকিছু থাকতে এই কুৎসিত পোকা কেন? তার কারণ হলো তেলাপোকা চরম দুর্বিষহ পরিবেশেও বেঁচে থাকতে পারে। দেখা গেছে যে, পৃথিবী যদি আকস্মিক তেজস্ক্রিয় বা পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়ে যায়, তার পরেও তেলাপোকা বেঁচে থাকবে। এছাড়া অনেক তাপমাত্রায়ও তেলাপোকা বেঁচে থাকতে পারে। এমনকি কোনো রাসায়নিক বিস্ফোরণ হলেও তাতে তেলাপোকা বেঁচে থাকতে পারে। যে কারণে মনে করা হয় পরিবেশের সব থেকে দুর্বিষহ অবস্থাতেও তেলাপোকা টিকে থাকতে পারে। তেলাপোকার একটি ডিএনএ'র ভেতর থাকে প্রায় ২.৯ বিলিয়ন ক্রম। যা প্রায় ৭৫০ মেগাবাইট ডেটা হতে পারে। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে হলো একটি তেলাপোকার ডিএনএ'র ভেতর যদি তথ্য সংগ্রহ করে রাখা যায়, তাহলে ভবিষ্যতে এই তথ্য থাকবে যুগ যুগ বছর পরেও!

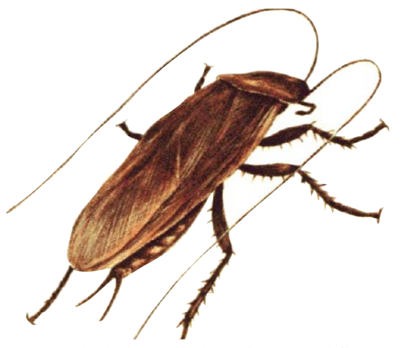

এ তেলাপোকাতেও তথ্য সংগ্রহ করে রাখা সম্ভব!

তবে ডিএনএ'র একটি মজার ব্যাপার হলো, ডিএনএ'তে যেসব তথ্য থাকে তার সবই যে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা কিন্তু নয়। এর মাত্র তিন শতাংশ (৩%)-এর ভেতরে থাকে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। যেমন তেলাপোকার ক্ষেত্রে ২.৯ বিলিয়নের ৩% অর্থাৎ প্রায় ২২ হাজার তথ্য সংগ্রহ থাকে। আর বাকি ৯৭% যে তথ্য থাকে সেগুলোকে সাধারণত বলা হয় বিভিন্ন ধরনের অজানা তথ্য, যেমন বিভিন্ন ধরনের খালিস্থান বা জাংক (অপ্রয়োজনীয়) তথ্য। ডিএনএ'র ভেতর এসব অজানা তথ্য কী তা আমরা এখনো জানি না। তবে এটা নিয়ে বেশকিছু মজার গল্প আছে বিজ্ঞানীদের মধ্যে। যেমন, এই ডিএনএ'র ভেতরেই কোনো অজানা তথ্য লুকানো আছে কি-না সেটাও বের করার চেষ্টা চলছে। ডিএনএ'র ডাবল হেলিক্সের যে গঠন আবিষ্কার করেছিলেন ফ্রান্সিস ক্রিক, তিনি ১৯৭৩ সালে বলেছিলেন, আমাদের পৃথিবীতে ডিএনএ'টা মূলত এসেছে বাইরের বিশ্বের কোনো একটা গ্রহ থেকে। তাই অনেকে মনে করে থাকেন হয়তো ডিএনএ'র ভেতর এমন কোনো গোপন তথ্য সগ্রহ করা আছে যেটা আমরা জানি না। আপনারা অনেকে জানেন SETI (Search for Extra-Terrestrial Intelligence) নামে একটা প্রোগ্রাম আছে। SETI আকাশের বিভিন্ন বেতার তরঙ্গকে পর্যবেক্ষণ করে দেখে সেই তরঙ্গের মধ্যে কোনো তথ্য আছে কি-না। এ ধরনের বহির্জগতে বা অন্য গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব খোঁজাকে বলা হচ্ছে আউট ওয়ার্ল্ড। অর্থাৎ বাইরের বিশ্বের তথ্যগুলোর মধ্যে কোনো গোপন তথ্য আছে কি-না সেটি খুঁজে বের করা। তবে ডিএনএ'র ভেতরে কোনো তথ্য আছে কি-না সেটি খোঁজার প্রক্রিয়াকে বলে ইন ওয়ার্ল্ড; অর্থাৎ আমাদের ভেতরেই কোনো তথ্য আছে কি-না।

এটা নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ আছে

ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার জিল বেজেরানো বলেন, ডিএন'র মধ্যে এখন অনেক তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যেটিকে অনেকেই অনেকভাবে ব্যাখ্যা করছেন। তবে এটা কাকতালীয় ব্যাপারমাত্র। আসল তথ্যের সঙ্গে এটার কোনো সম্পর্ক নেই। যেভাবে অনেকে বাইবেলের ভেতরে বিভিন্ন ধরনের গোপনীয় কোড খুঁজে পায়। হয়তোবা ওটার মূল লক্ষ্য সেটা নয়, কিন্তু অনেকেই জোর করে যোগসূত্র বের করার চেষ্টা করছেন।

তবে ডিএনএ'কে তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যবহার করা যায় কি-না সেটাই হচ্ছে এখন আগ্রহের বিষয় এবং সংরক্ষণ করে রাখা গেলেও তা কতদিন পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকবে? ডিএনএ'র সব থেকে একটা বড় সমস্যা হলো যে, এখান থেকে খুব সহজে তথ্য পরিবর্তিত বা হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে জাপানিজ বৈজ্ঞানিক ড. তমিপা তথ্য সংগ্রহ করার যে পদ্ধতিটি উদ্ভাবন করেছেন, সেই পদ্ধতিতে ১৫% পর্যন্ত তথ্য যদি পরিবর্তিত হয়েও যায় সেটিকে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। অনেকের কাছে এই ১৫% অংকটি একটু কম মনে হলেও ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার ডিএনএ'তে এই ১৫% পরিবর্তন হতে সময় লাগবে ১ মিলিয়ন বছর। তাই সময় অনুযায়ী এটা হচ্ছে খুব কম পরিমাণের পরিবর্তন, যা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব।

এই পদ্ধতির একটি বড় গুরুত্ব আছে এই কারণে যে, তথ্যটাকে আমরা সংরক্ষণ করে রাখতে পারছি এবং সেই তথ্যকে আমরা বের করতে পারছি। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীর মতোই ড. বেজরানো মনে করেন, ডিএনএ'র ভেতর এভাবে তথ্য সংগ্রহ করে রাখাটা খুব 'বোকার' মতো উপায়। তার প্রধান কারণ হলো, এটা খুব সহজে হারিয়ে যেতে পারে। আবার আমরা এটার মধ্যে তথ্য রাখলাম, অথচ এটাকে সংগ্রহ করে রাখার পর যদি কেউ না পড়তে পারে, তাহলে এর কোনো মানেই হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মধ্যে এই নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক চলছে। বর্তমানে যারা ডিএনএ নিয়ে গবেষণা করছেন তাদের জন্য এটা একটা আলোচনার বিষয়।

এতদিন পর্যন্ত ডিএনএকে আমরা শুধু তথ্য ভাণ্ডার হিসেবে জানতাম এবং এখান থেকে আমরা তথ্যকে বের করে আনতে পারতাম এবং সেই তথ্যগুলো কীভাবে প্রোটিন তৈরি করে সেটা নিয়ে আমরা এতদিন গবেষণা করছিলাম। কিন্তু এখন বিষয়টাকে একটু অন্যভাবে দেখা হচ্ছে যে, এটার ভেতর কোনো তথ্য রাখা যায় কি-না; যেভাবে জাপানিজ দল আলবার্ট আইনস্টাইনের বিখ্যাত সূত্র $e=mc^2$ এবং তার বছরটা ১৯০৫ কে প্রবেশ করাতে সক্ষম হয়েছেন। শুধু তাই নয়, সেটা পড়তেও পারছেন। এই পদ্ধতিও আবিষ্কার করেছেন যে, এই তথ্য সংরক্ষণের পর যদি ১৫% নষ্টও হয়, সেটা পুনরুদ্ধার করা সম্ভব। এটাকে ডিএনএ গবেষণার ক্ষেত্রে একটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলা যায়।

গবেষণা চলছে অনেক পদ্ধতি নিয়ে

ভবিষ্যতে কম্পিউটারকে আরো উন্নত করার জন্য বিভিন্ন মিডিয়ায় তথ্য সংরক্ষণ করে রাখার কথা ভাবা হচ্ছে যেমন, ত্রিমাত্রিক হলোগ্রামের মধ্যে কোনো তথ্য রাখা যায় কি-না, আবার কিছু বিজ্ঞানী গবেষণা করছেন ক্রিস্টালের ভেতর তথ্য রাখা যায় কি-না। এরকম অনেকেই অনেক পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তবে এটা নতুনভাবে আসছে যে, ডিএনএ'র ভেতরেও রাখা যায় কি-না এবং জাপানিজ বিজ্ঞানীরাও প্রমাণ বরলেন যে, ডিএন'র ভেতরেও তথ্য রাখা যায়।

এভাবেই চলছে বিজ্ঞানীদের ডিএনএ নিয়ে গবেষণা। আউট ওয়ার্ল্ডের জন্য SETI প্রোগ্রাম ব্যবহার করে বাইরের বিশ্ব থেকে কোনো বার্তা আসছে কি-না সেটা খোঁজার চেষ্টা করা হচ্ছে; আবার তেমনি ইন ওয়ার্ল্ডে অন্য কেউ ডিএনএ'র ভেতর কিংবা অন্য কোথাও তথ্য সংগ্রহ করে রেখেছে কি-না সেটার চেষ্টাও চলছে। এখানে 'অন্য কেউ' বলতে কেউ বলছেন বাইরের বিশ্বের এলিয়েন, আবার কেউ বলছেন প্রভু। এভাবেই ইন ওয়ার্ল্ড আউট ওয়ার্ল্ড নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে সারমর্ম হলো ডিএনএ নিয়ে গবেষণাগুলো খুবই আকর্ষণীয় এবং নতুন নতুন আবিষ্কার আরো আসছে।

লেখক আমেরিকার মার্শাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যানোবায়োটেকনোলজি বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মরত। লেখকের সম্পাদিত বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রবন্ধের জন্য পড়ুন- http://biggani.org

mashiur.rahman@gmail.com

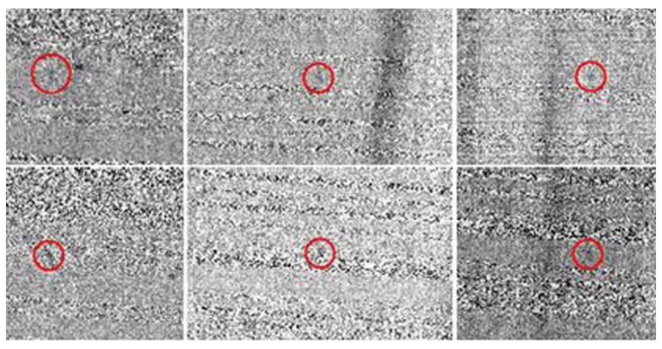

মহাকাশের দূরবর্তী এলাকায় গ্যালাক্সির সন্ধান মিলেছে

সেলিনা আক্তার

আন্তর্জাতিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের একটি দল 'গ্র্যাভিয়েশনাল লেন্সিং' পদ্ধতি ব্যবহার করে মহাকাশের সবচেয়ে দূরবর্তী এলাকায় বেশ কয়েকটি গ্যালক্সির সন্ধান পেয়েছে। তারা বলছেন, ওই এলাকায় এর আগে কখনোই চোখ বুলানো সম্ভব হয়নি। ওই গ্যালাক্সিগুলো থেকে আলো আসতে ১,৩০০ কোটি বছরেরও বেশি সময় লেগেছে। লন্ডনে জিওলজিক্যাল সোসাইটির এক সম্মেলনে অস্পষ্ট ওই দূরবর্তী গ্যালাক্সির চিত্র উপস্থাপন করেছেন দলনেতা ক্যালটেকের জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রফেসর রিচার্ড ইলিস।

দূরবর্তী কোনো বস্তুর আলো যখন বড় আকারের কোনো বস্তুর পাশ দিয়ে যায় তখন সেই আলো বেশ কিছুটা বেঁকে যায়। এটি গ্র্যাভিয়েশনাল লেন্সিং নামে পরিচিত। ক্যালটেকের দলটি এই পদ্ধতিতেই অনুসন্ধান কাছ করেছে। তাই সাধারণ পদ্ধতিতে যা ধরা পড়ে না, গ্র্যাভিয়েশনাল লেন্স পদ্ধতিতে তা তারা খুঁজে পেয়েছে। দলটি দূরবর্তী গ্যালাক্সি অনুসন্ধানে ব্যবহার করেছে শক্তিশালী টেলিস্কোপ কেক-টু। এর রয়েছে ১০ মিটার ব্যাসের আয়না। হাওয়াইয়ের মাওনা কিয়ায় এটি স্থাপিত।

রিচার্ড ইলিস বলেছেন, তাদের দলটি নির্বাচিত কয়েকটি কাস্টারের ওপর নজর রাখতে গিয়ে আরো দূরবর্তী অঞ্চলে তারা সৃষ্টি হচ্ছে এমন ৬টি গ্যালাক্সি চিহ্নিত করেছে।

গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট ড্যান স্টার্ক তার এক থিসিসে বলেছেন, ৩ বছর ধরে কেক-টু টেলিস্কোপ দিয়ে ওই দূরবর্তী বস্তু তারা পর্যবেক্ষণ করেছেন। যে ছয়টি গ্যালাক্সির সন্ধান মিলেছে তাদের সিগনাল অত্যন্ত সক্রিয়। এই আবিষ্কার এটারই ইঙ্গত দেয় যে, মহাকাশের দূরবর্তী অঞ্চলে গ্যালাক্সি বিরল নয়। বরং এদের সংখ্যা হতে পারে ধারণার চেয়ে অনেক বেশি। এদের সৃষ্টি হয়েছে মহাকাশ সৃষ্টির প্রথম দিকে। স্পিটজার মহাকাশ টেলিস্কোপ দিয়েও বহু গ্যালাক্সির সন্ধান মিলেছে, যখন এই মহাবিশ্বের বয়স ছিল ৩০ থেকে ৫০ কোটি বছর। কেক-টু টেলিস্কোপ দিয়ে পাওয়া অস্পষ্ট ৬ গ্যালাক্সি আরো প্রথম দিকের বলে মনে করা হচ্ছে।

মহাবিশ্বের বয়স যখন ৩ লাখ বছর তখন এমন একটি সময় ছিল বলে ধারণা করা হয়, যখন কোনো তারা আলো দিত না। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা এ সময়কে 'ডার্ক এজ' বা অন্ধকার যুগ বলে আখ্যায়িত করেন। ঠিক কখন থেকে তারা এবং গ্যালাক্সি জ্বলে ওঠে তা এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, একদিন এ রহস্যের উন্মোচন ঘটবে। আর এটা সম্ভব হবে ইউরোপিয়ন সাউদার্ন অবজারভেটরির এক্সট্রিমলি লার্জ টেলিস্কোপ (ইএলটি), যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার থার্টি মিটার টেলিস্কোপ (টিএমটি) এবং ওয়েব টেলিস্কোপের মতো শক্তিশালী টেলিস্কোপ ব্যবহার করে। কেক-টু ব্যবহার করে যে গবেষণা চলছে তা এখনো শেষ হয়নি। প্রাথমিক চিত্র কেবল প্রকাশ করা হয়েছে। যে দলটি গবেষণা করছে তাতে আরো রয়েছেন মার্সেইলেসে ল্যাবরেটরি অব অ্যাস্ট্রোফিজিক্সের প্রফেসর জিন পল লেইব এবং বার্মিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. গ্রাহাম স্মিথ।

এই একই বিষয় নিয়ে পৃথকভাবে কাজ করছেন ক্যালটেকের পোস্টডক্টরাল স্কলার ড. জোহান রিচার্ড। তিনি তার কাজে ব্যবহার করছেন হাবল এবং স্পিটজার মহাখাশ টেলিস্কোপ।

সাইবেরিয়ায় শিশু ম্যামথের সন্ধান

দেবব্রত দাস

উত্তর সাইবেরিয়া ইয়ামাল উপদ্বীপে বরফের নিচে ১০ হাজার বছরের পুরনো এটি শিশু ম্যামথের (অধুনালুপ্ত লোমশ হাতি) সন্ধান পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। তারা আশা করছেন, এই আবিষ্কার তাদের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে গবেষণায় সহায়ক হবে। ম্যামথের বয়স ৬ মাস এবং এটি মেয়ে শিশু। রাশিয়ান একাডেমি অব সায়েন্সেসের জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউটের ডেপুটি ডিরেক্টর অ্যালেক্সি টিখোনভ বলেছেন, ম্যামথটির শুঁড় ও চোখ অক্ষত রয়েছে। এমনকি শরীরে কিছু লোমও পাওয়া গেছে। এটি ৪ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা। ওজন ৫০ কেজি। বরফযুগের শেষদিকে তার বিচরণ ছিল। গত মে মাসে বলগা হরিণ পালক ইউরি খুদি এর সঙ্গে হোঁচট খেলে এটি আবিষ্কার হয়। ম্যামথটির দেহে কোনো খুঁত পাওয়া যায়নি। তবে লেজের কিছু অংশ নেই।

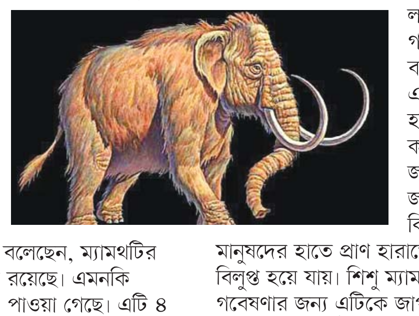

বিশেষজ্ঞদের আন্তর্জাতিক একটি দল সম্প্রতি ম্যামথটির ওপর প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ ডাকোটার হট স্প্রিং গবেষণা কেন্দ্রের ম্যামথ শাখার পরিচালক ল্যারি আজেনবোর্ড জানান, যে কোনো অবস্থাতেই ম্যামথ শিশু খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। ধারণা করা হয়, ৪৮ লাখ বছর থেকে গত ৪ হাজার বছর আগ পর্যন্ত এই লোমশ হাতিরা বাস করত। গবেষণায় জানা যায়, জলবায়ু পরিবর্তন কিংবা শিকারি মানুষদের হাতে প্রাণ হারাতে হারাতে তারা বিলুপ্ত হয়ে যায়। শিশু ম্যামথটি নিয়ে আরো গবেষণার জন্য এটিকে জাপানের একটি ইনস্টিটিউটে পাঠানো হবে। বিজ্ঞানীরা আশা করছেন, ম্যামথটির দেহে সংরক্ষিত শুক্রাণু বা অন্যান্য কোষে থাকা ডিএনএ থেকে ম্যামথকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। ক্লোনিংয়ের সম্ভাবনা নিয়েও ভাবা হচ্ছে।

শেষ হলো ডেফোডিল ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কনটেস্ট

Prize Giving Ceremony

প্রতিযোগিতা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিদের সঙ্গে বিজয়ীরা

আতাউর রহমান কাবুল

সম্প্রতি শেষ হলো মেধা প্রতিযোগিতার আসর '২য় ডেফোডিল ইন্টার ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রামিং কনটেস্ট ২০০৭'। গত শুক্রবার সকাল ৮টায় মূল প্রতিযোগিতা শুরু হয় ডিআইইউ মূল ক্যাম্পাসে, চলে বেলা দেড়টা পর্যন্ত। ৩ সদস্যের প্রতিযোগী দলের সঙ্গে ১ জন করে প্রশিক্ষক দায়িত্ব পালন করেন। প্রতিযোগীদের ৯টি সমস্যা সমাধানের জন্য বলা হয়।

অংশ নিয়েছিল ৬৩টি টিম

এ প্রতিযোগিতায় দেশের মোট ২৬টি সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬৩টি টিম অংশগ্রহণ করে। বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ-সাউথ, ইস্টওয়েস্ট, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল, ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক টিম এ প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতার পৃষ্ঠপোষকতা দরকার

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল এবং অধ্যাপক এম কায়কোবাদের নেতৃত্বে বিচারকমণ্ডলী প্রতিযোগিতা স্থল পরিদর্শন করেন। প্রতিযোগিতা শেষে বিচারকার্য শুরু হয়। ওইদিন বিকালে প্রতিযোগিতার ফল ঘোষণা এবং পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান মোঃ সবুর খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান।

শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আমিনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ডিআইইউ প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর এম শাহজাহান মিনা এবং এসিএম প্রোগ্রামিং কনটেস্টের বিচারক শাহরিয়ার মঞ্জুর, কনটেস্ট ২০০৭ কারিগরি কমিটির প্রধান ড. কায়কোবাদ বক্তব্য রাখেন। বিচারক কমিটির প্রধান অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল বক্তৃতা শেষে প্রতিযোগিতার কাঙ্ক্ষিত ফল ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, আমাদের দেশে জ্ঞানভিত্তিক প্রতিযোগিতার জন্য পৃষ্ঠপোষক পাওয়া যায় না। খেলাধুলা বা তথাকথিত গান ও ফান প্রতিযোগিতায় পৃষ্ঠপোষকতা বা স্পন্সরের অভাবও দেখা যায় না। তিনি মেধা প্রতিযোগিতায় স্পন্সরদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি স্ব-অর্থায়নে জাতীয় পর্যায়ে এমন আয়োজনের জন্য ডেফোডিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সাধুবাদ জানান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রফেসর ড. তারেক শামসুর রেহমান তরুণ প্রোগ্রামারদের পারদর্শিতার প্রশংসা করে বলেন, মেধা দৌড়ে আমাদের ছেলেরা পিছিয়ে নেই। আজকের তরুণ প্রোগ্রামাররা বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের নাম উজ্জ্বল করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতির ভাষণে মোঃ সবুর খান বলেন, আমাদের মেধাবী ছেলেদের আমরা ধরে রাখতে পারছি না, অন্যদিকে ছেলেদের লক্ষ্য নির্ধারণে ব্যর্থতা কিংবা সঠিক পরামর্শের অভাব মেধা বিকাশ এবং প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বড় সমস্যা। তিনি তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়নে অব্যাহত সহযোগিতাসহ তরুণদের মনোবল ও লক্ষ্য স্থির রেখে যাত্রা শুরুর আহ্বান জানান। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডিআইইউ ফ্যাকাল্টি অব সায়েন্স অ্যান্ড আইটি'র ডিন প্রফেসর ড. এম লুৎফর রহমান।

প্রতিযোগিতার ফলাফল

১ম, ২য় এবং ৩য় তিনটি শীর্ষ স্থানই দখল করে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ৪র্থ স্থান অধিকার করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে ১ম থেকে ১০ম স্থান অধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। ১ম স্থান অর্জনকারীকে ৩০ হাজার টাকা, ২য় স্থান অর্জনকারীকে ২১ হাজার টাকা, ৩য় স্থান অর্জনকারীকে ১৫ হাজার টাকা এবং ৪র্থ স্থানের জন্য ৯ হাজার টাকা ক্যাশ মানি প্রদান করা হয়। এছাড়া অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করা হয়। উল্লেখ্য, ২০০৩ সালে ডেফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি প্রথমবার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এটা তাদের দ্বিতীয় আয়োজন।

arkabul@yahoo.com

সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে রাগান্বিত হোন

কামরুল হাসান লিটন

রাগের বশীভূত হয়ে কোনো কাজ সুফল বয়ে আনে না। রাগান্বিত ব্যক্তিকে অন্যরা ভালো চোখে দেখে না। এরা বিশ্বস্ত হয় কম। ঝোঁকের মাথায় সিদ্ধান্ত নেয়। ফলে জীবনে এদের সাফল্যও আসে কম। রাগ বা ক্রোধ সম্পর্কিত উপরোক্ত মন্তব্যগুলো আজ আর বাস্তবসম্মত মনে করার কারণ নেই। যুক্তরাষ্ট্রের বেশ ক'জন মনোবিজ্ঞানী রাগ বা ক্রোধ সম্পর্কিত উপরোক্ত মন্তব্যগুলোকে অযৌক্তিক আখ্যায়িত করে বলেছেন, বাস্তবতা পুরোপুরি ভিন্ন। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। তারা সবার প্রতি এই উক্তিই করেছেন যে, যখন কোনো বিষয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় তখন রাগান্বিত হোন। ক্রোধোন্মত্ত অবস্থায় যে সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে আসবে তাই হবে সবচেয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত। অবশ্য এর আগে এ সম্পর্কিত এক গবেষণায় বলা হয়েছিল, রাগান্বিত হলে কোনো ব্যক্তি সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঝুঁকি নিতে পছন্দ করে। তবে তা সঠিক বা ভুল দুই-ই হতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তাবারবারায় বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষক মনোবিজ্ঞানী ওয়েসলি মুন ও তার সহকর্মী দিয়ানা ম্যাকি বলেন, দৈনন্দিন জীবনে এমন অনেক সময় আসে যখন কোনো সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়াটা দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। বেশ কিছু পথে হয়তো এর সমাধান হতে পারে। তবে কোন পথটি সর্বাপেক্ষা সঠিক হবে তা বাছাই করাটাই হয়ে দাঁড়ায় মূল সমস্যা। এ অবস্থায় যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রেগে যান তাহলে ওই বিষয়ে তার মনোসংযোগ অন্য সময়ের তুলনায় বেড়ে যায়। ফলে এ সময়ে যে সিদ্ধান্তটি মাথায় আসে তাই সর্বাপেক্ষা সঠিক হয়ে ওঠে। বিষয়টি নিয়ে তারা একদল কলেজ ছাত্র নিয়ে তিন পর্বের পরীক্ষা চালান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে তারা এই উপসংহারে পৌঁছেন যে, রাগান্বিত অবস্থায় নেয়া সিদ্ধান্তের ধরনটা বিশ্লেষণ পদ্ধতিমূলক হয় না। অর্থাৎ সিদ্ধান্তটা বেরিয়ে আসে সরাসরি পথে; নানা বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঘুরানো পথে যুক্তিতর্কের সূক্ষ্মতার মধ্য দিয়ে নয়।

কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানী জেনিফার লারনার একই বিষয়ে আলাদাভাবে ব্যাপক গবেষণা চালিয়ে একই অভিমত ব্যক্ত করেছেন। গবেষণা পত্রে তিনি উল্লেখ করেছেন, রাগ কোনো ব্যক্তির জন্য খারাপের চেয়ে অধিক পরিমাণে মঙ্গালদায়ক। সুতরাং বিস্ফোরিত হওয়ার আগের পর্যায় পর্যন্ত রেগে উঠুন। তিনি যেসব পরীক্ষা চালান তা পর্যবেক্ষণে তিনি মূলত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মুখের অভিব্যক্তি ও তার শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তনকে প্রাধান্য দেন। গবেষণার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯২ জন উচ্চ শিক্ষার্থীকে বেছে নেন। একাধিক পর্বে তিনি সংশ্লিষ্টদের নানা উল্টোপাল্টা প্রশ্নের মাধ্যমে জর্জরিত করে ছাড়েন। কারণ তার গবেষণার মূল উদ্দেশ্যই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের যতটা সম্ভব রাগান্বিত করা। তার প্রশ্নের ধরন অনেকটা এমন যে, ৬,২৩৩ অংক থেকে ১৩ ব্যবধানে উল্টো গুনে আসতে বলেন। যে যত দ্রুত গণনা শেষ করবে সে হবে জয়ী। তবে শর্ত াকে যে, ভুল উত্তর দিলে তাকে পুনরায় প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। অনুরূপ আরেকবার ৯,০৯৫ থেকে ৭ অংকের ব্যবধানে নিচের দিকে ক্রমান্বয়ে গণণা করতে হবে। স্বভাবতই এই কাজ করতে গিয়ে তাদের চেহারায় প্রচণ্ড রাগ, বিরক্তি, ভয় ইত্যাদি অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে। তিনি প্রক্রিয়াটি চলাকালীন পুরো দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করেন। নোট করে রাখেন তাদের রক্তচাপ, পালস রেট ও দেহে হরমোন সঞ্চালনের তারতম্যের বিষয়গুলো। পরে গণনার ফল ও ওই কাজটি করাকালীন তাদের মুখের অভিব্যক্তি ও অন্যান্য উপসর্গ মিলিয়ে তিনি দেখতে পান, যারা বেশি রাগান্বিত হয়েছেন তাদের কাজটি হয়েছে অন্যদের তুলনায় অধিকতর সঠিক ও যুতসই। তবে কিছু ব্যতিক্রমও দেখা গেছে। যেমন দু-একজনকে পাওয়া গেছে যারা তাদের রাগ বা বিরক্তি অতি সযতনে গোপন রাখতে সমর্থ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, মনে হয়েছে তারা যে তাদের রাগটা প্রকাশ করছেন না, এটা নিয়ে বেশ মজাও পাচ্ছেন। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী জেনিফার লারনার অন্য পথে অগ্রসর হন। তিনি তাদের বিষয়টি শনাক্ত করতে অন্যান্য উপসর্গ মিলিয়ে দেখেন। এতে করে শতভাগ নিশ্চিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সমর্থ হন। উপরোক্ত কয়েকজন মনোবিজ্ঞানীর গবেষণালব্ধ ফল একটা বিষয় সুনিশ্চিত করেছে যে, আপাতদৃষ্টিতে রাগান্বিত হওয়াটা একজনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়ার কারণ হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এটা ইতিবাচক একটা গুণ। সুতরাং রেগে উঠুন। একেবারে রাগে বিস্ফোরিত হওয়ার আগের পর্যায় পর্যন্ত।

liton9@hotmail.com

গেমস কর্নার

ট্রাকমেনিয়া ইউনাইটেড

হাসিব রেজা

কম্পিউটারের রেসারভিত্তিক গেমারদের জন্য ভিন্ন আঙ্গিকের গেমস 'রেস-দ্য ডব্লিউটিসিস গেম'। খ্যাতনামা ফ্রাঞ্চ ডেভেলপার নেডইও এ গেমটি নির্মাণ করেছে। ফোকাস হোম ইন্টারঅ্যাক্টিভের ব্যানারে মাল্টিবিলিয়ন ডলারের এ গেমটির মূল আকর্ষণ ভিন্নধর্মী অ্যাকশন, যা প্রচলিত ধারার রেসিং গেমগুলো থেকেই একেবারে ব্যতিক্রম।

গেমটির এ ভার্সনে রয়েছে বিশেষ কিছু চমৎকার দিক। ভার্সনটিতে সংযুক্ত করা হয়েছে বেশকিছু নতুন ধরনের ট্রাক, চমকপ্রদ অনলাইন সাপোর্ট এবং সর্বোপরি ব্যতিক্রমী গেমপ্লে কন্ডিশন। গেমটিতে আরো রয়েছে ট্রাক এডিটর, যাতে করে গেমার নিজের থেকেই ট্রাকগুলো রূপান্তর করে ডিজাইন করতে পারবেন। ভার্সনটিতে গেমারকে প্রথমে একটি রেস দিয়ে খেলা শুরু করতে হবে এবং প্রতিটি রেসই গেমারকে বেশ ভালোভাবে শেষ করার চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে একটি লেভেল শেষ করার পরে পরবর্তী লেভেল আসবে। পুরো গেমটিতে বিভিন্ন ধরনের রেসিংয়ের মোড রয়েছে, যার মধ্যে অন্যতম রেসিং, সোলো, পাজল, সানসেট এবং প্লাটফর্ম মোড প্রভৃতি। তবে রেসিং মোডই এর প্রধান দিক। এখানে গেমার চাইলে চাইম ট্রায়াল কিংবা গোল্ড, সিলভার কিংবা ব্রোঞ্জ অপশনে খেলতে পারেন। আরো রয়েছে বিভিন্ন আনলক অপশন। গেমারকে খেলার মাধ্যমেই এসব অপশনগুলো আনলক করতে হবে। গেমটির বিশেষ দিকটি হলো এখানকার প্রতিটি মোড কিংবা রেসের ধরন আলাদা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই গেমার নতুন ধরনের রেসিং স্টাইল, ভিন্ন সিকোয়েন্স কিংবা আলাদা স্টেডিয়াম পাবেন। আর প্রতিটি বিষয়ই বিশ্বের সেরা প্রতিযোগিতা এবং তাতে সংযুক্ত বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখেই তৈরি করা হয়েছে। গেমটির অনলাইন মোডটিও দারুণ আকর্ষণীয়। চমকপ্রক এ মোডে গেমাররা হাজারের ওপর ট্রাক পাবেন, যা এখনকার কোনো গেমেই দেখা যায় না। এ মোডে ৩২ জন খেলতে পারবেন।

গেমটির চমৎকার গ্রাফিক্স কোয়ালিটি। পুরো গেমটিতে পাওয়া ডেভেলপারদের নিপুণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যাবে। গেমটিতে পার পিক্সেল শেডিং, অত্যাধুনিক টেকনোলজি গ্রাফিক্স সংযোজন করা হয়েছে। ফলে গেমটির বিভিন্ন ট্রাক বেশ চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বাস্তবিক রেসের আবহ ফুটিয়ে তুলতে গেমটির বিভিন্ন ট্রাক বাস্তব অনুসারে নির্মিত হয়েছে। এর পাশাপাশি ছোটখাটো বিষয় বেশ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তাছাড়া গেমটির বিভিন্ন সিকোয়েন্সের অসম্ভব সব স্থিরচিত্রের ভিজ্যুয়াল চিত্রায়ন এর যথার্থ আকর্ষণ। অন্যদিকে এর সাউন্ড কোয়ালিটিও ভালো। গেমটিতে পাওয়া যাবে ডিজিটাল ডলবি সাপোর্ট।

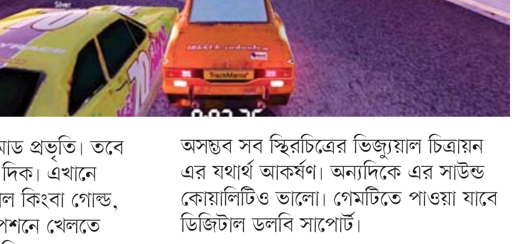

সিস্টেম রিকয়্যারমেন্ট

অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ এক্সপি/ভিসতা, পেন্টিয়াম ফোর বা এএমডি এথলন ১.৬ গিগাহার্জ বা সমমানের প্রসেসর, র‍্যাম ২৫৬ মেগাবাইট, এজিপি ১৬ মেগাবাইট, ডাইরেক্ট এক্স ৯.০সি এবং ১৫০০ মেগাবাইট ফ্রি হার্ডডিস্ক স্পেস।

hrony2005@yahoo.com